প্রকৃতি রক্ষার দায় আজ সবার

দীপংকর বর

প্রকৃতি মানে জীবনের মৌলিক আধার—জল, বায়ু, মাটি, আলো, গাছপালা, প্রাণীকুল। আমরা যেখানেই যাই, যেভাবেই বাঁচি—প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে আমাদের পক্ষে এক মুহূর্তও টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ আমরা মানুষই সেই প্রকৃতির প্রতি সবচেয়ে অবিবেচক। উন্নয়নের নামে আমরা প্রতিদিন উজাড় করছি বন, দখল করছি নদী, নির্মূল করছি জীববৈচিত্র্য এবং দূষণ করছি বাতাস ও পানির প্রতিটি স্রোতধারা। ফলশ্রুতিতে দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র। এ অবস্থায় প্রতিবছর ২৮ জুলাই পালিত হয় বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস, যার মূল উদ্দেশ্য—মানবজাতিকে প্রকৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা। গাছ লাগানো, নদী পরিষ্কার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক ক্যাম্পেইন ও সংস্কৃতিভিত্তিক পরিবেশ প্রচারনা—সবই এ দিবসের উদ্দীপনাকে ছড়িয়ে দেয় বিশ্বের নানা প্রান্তে। ২০২৫ সালের বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জীববৈচিত্র্য রক্ষা, অবনমিত বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা প্রচারের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া।

বর্তমানে পৃথিবী এক গভীর পরিবেশ সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। পৃথিবীর স্থলভাগ এবং সামুদ্রিক পরিবেশ ইতোমধ্যেই মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে গুরুতরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাড়ছে উষ্ণতা, গলছে মেরু অঞ্চলের বরফ, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং হুমকির মুখে পড়ছে বিশ্বের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ। বিশ্বের নানা প্রান্তে ঝড়, বন্যা, খরা ও দাবদাহের মতো চরম আবহাওয়া এখন নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশেও পরিবেশগত সংকটের মাত্রা ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। দেশের বনভূমির পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় অপ্রতুল। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বিচারে পাহাড় কাটা, সিলেট অঞ্চলে জলাভূমি ভরাট, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবনের চারপাশে অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা, ঢাকার আশেপাশে নদী দখল ও দূষণ—সবই দেশের বাস্তুতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলেছে। নদীগুলো মৃতপ্রায়, নদীভাঙনে প্রতিবছর হাজারো পরিবার গৃহহীন হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততা বেড়ে খাদ্য উৎপাদন ও পানির যোগান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

তবে শুধু সমস্যা চিহ্নিত করলেই হবে না, বরং সমাধানমূলক উদ্যোগও নিতে হবে—এটাই বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবসের মূল বার্তা। বাংলাদেশ সরকার এই সংকট মোকাবিলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, বননীতি, জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে ৫৬টিরও বেশি সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। সুন্দরবন, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, রামসার সাইটসহ বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করা হয়েছে। বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসন মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দখলদার ও দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বর্তমান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টার নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বনের জমিতে সরকারি প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলো বাতিল করে কক্সবাজারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লোকপ্রশাসন একাডেমির জন্য নির্ধারিত ৭০০ একর এবং বাফুফের 'টেকনিক্যাল সেন্টার' নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ একর সংরক্ষিত বনভূমি সফলভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও, বেজাকে দেওয়া সোনাদিয়ার ৯ হাজার ৪৬৭ একর জমি এবং চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ২২ হাজার ৩৫৫ একর বনভূমির মধ্যে ৪ হাজার ১০৪ একর বনবিভাগের কাছে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাফর আলম ক্যাডেট কলেজের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া ১৫৫.৭০ একর বনভূমিও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বন অধিদপ্তর ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় ৫ হাজার ৯৩.৪৪ একর জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করে বনায়ন করা হয়েছে, যা পরিবেশ সুরক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ সুরক্ষায়ও বাংলাদেশ সচেষ্ট। মৌলভীবাজারের

লাঠিটিলায় প্রস্তাবিত সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে এবং পরিবেশগত বিবেচনায় ১৭টি পাথর কোয়ারির ইজারা প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক ও উদ্ভিদ উদ্যানে প্লাস্টিক ও বনভোজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বাচলে ১৪৪ একর এলাকাকে জীববৈচিত্র্য অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা এবং রাজশাহীতে দেশের প্রথম ২টি জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। মধুপুরে ৭৫০ একর শালবন পুনরুদ্ধারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় বন্যপ্রাণীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯৪ জনকে ২ কোটিরও বেশি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। মধুপুর জাতীয় উদ্যানে ময়ূর ও কাছিম অবমুক্ত করে হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে ইউক্যালিপটাস ও আকাশমনি গাছের চারা রোপণ, উত্তোলন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে ১২৩৬টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২৫.৭০ কোটি টাকা জরিমানা আদায়, ৪৮৪টি ইটভাটা ভাঙা এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৮৬ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ফেজ আউটের লক্ষ্যেও ১৭টি পণ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পর্যটকদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ইসিএ) নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ। এছাড়া সরকার প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। নদী পুনরুদ্ধার, খাল খনন, বনায়ন কর্মসূচি, জলাভূমি সংরক্ষণ, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন সম্প্রসারণ, কৃত্রিম জলাধার তৈরি ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এসব উদ্যোগ শুধু প্রকৃতি রক্ষা করছে না, বরং মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও সহায়ক হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যানগ্রোভ বন ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করে, নদী খনন বন্যার প্রকোপ হ্রাস করে, হাওর ও জলাভূমি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তবে প্রকৃতি সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল সরকারের একার নয়, এ দায় ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও প্রতিটি নাগরিকের। আমাদের প্রত্যেকের আচরণই প্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। আমরা যদি প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার কমাই, বাসাবাড়িতে পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করি, প্রয়োজনে নিজ হাতে একটি গাছ লাগিয়ে তার পরিচর্যা করি, তাহলে তা প্রকৃতি সংরক্ষণের পথে এক বাস্তব অবদান হতে পারে। আমাদের পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে ছোটো ছোটো পরিবর্তনের মাধ্যমে বড়ো পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হবে প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলনে। বিশ্বজুড়ে আজকের তরুণরাই পরিবেশ আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের তরুণরাও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন গড়ে তুলছে, গাছ লাগাচ্ছে, নদী পরিষ্কার করছে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। এই উদ্যোগগুলো যত বাড়বে, তত প্রকৃতির পাশে দাঁড়াবে মানুষ। গণমাধ্যম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও আছে অপরিসীম ভূমিকা। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন পোর্টাল প্রভৃতি পরিবেশ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ফিচার, প্রতিবেদন, মতামত, সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে পারে। শিশুসাহিত্য, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকে প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিলে ছোটোবেলা থেকেই পাঠকদের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম গড়ে ওঠে। একসময় কাব্য সাহিত্যে প্রকৃতি ছিল এক জীবন্ত চরিত্র—আমরা যদি সেই চর্চা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃতি সংরক্ষণকে শুধু দায়িত্ব নয়, ভালোবাসার অংশ বলেও ভাববে। এই বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবসে তাই আমাদের প্রত্যেকের কাছে বার্তা একটাই—প্রকৃতি কোনো বিলাসিতা নয়, এটিকে থাকার পূর্বশর্ত। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বরং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান নিশ্চিত করেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জনসম্পৃক্ততা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—মানসিক পরিবর্তন। আমরা যদি প্রকৃতিকে সম্মান করি, প্রকৃতি আমাদের জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ রাখবে। কিন্তু আমরা যদি অবহেলা করি, প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিতে পারে ভয়াবহ রূপে—দাবদাহ, বন্যা, ঝড়, খরা কিংবা মহামারির মাধ্যমে। অতএব, ২৮ জুলাই শুধু একদিনের প্রতীকী আয়োজন নয়—এই দিনটি হোক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তরের সূচনা। যেখান থেকে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস নয়, প্রকৃতির সঙ্গে বাঁচার পথ খুঁজে নিই।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার